Hydra-র পুনরুৎপত্তি (Regeneration): যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণী হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশকে দেহে পুনর্গঠন করে তাকে পুনরুৎপত্তি (regeneration) বলে। *Hydra*-র ব্যাপক পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। আব্রাহাম ট্রেমলে (Abraham Trembley, 1744) প্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো *Hydra*-কে যদি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় তাহলে প্রত্যেক খণ্ডই এর হারানো অংশকে পুনরুৎপাদন করে নতুন *Hydra* সৃষ্টি করে। প্রতিটি অংশই তার মূল মেরুতা বজায় রাখে অর্থাৎ মৌখিক প্রান্ত (oral end) থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং বিমৌখিক প্রান্ত (aboral end) থেকে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।একটি *Hydra*-র মাথা অনুদৈর্ঘ্যভাবে দুভাগে ভাগ করলে দুই মাথাওয়ালা *Hydra*-র আবির্ভাব ঘটে।*Hydra*-র এ ধরনের স্বভাবের জন্য রূপকথার দানব হাইড্রা-র নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এ দানবের নয়টি মাথা ছিল। রূপকথা অনুযায়ী হারকিউলিস (Hercules) নামক এক শক্তিধর মানব এ দানবের একটি মাথা কেটে ফেললে ঐ স্থানে দুটি মাথা গজাতো।

(ক) একটি *Hydra* থেকে তিনটি
(খ) দুই মাথাওয়ালা *Hydra* সৃষ্টি

Hydra-র জনন (Reproduction of Hydra)

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশধর রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে জনন বলে । এ প্রক্রিয়ায় জীব দেহাংশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে (অযৌন) বা একই প্রজাতির অন্য সদস্যের সহযোগিতায় ও গ্যামেট সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে (যৌন) নিজ আকৃতিসদৃশ বংশধর সৃষ্টি করে । *Hydra* অযৌন ও যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে ।

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন সম্পাদিত হয় তাকে অযৌন জনন বলে । এ ধরনের জনন পদ্ধতিতে মাতৃ *Hydra* থেকেই নতুন *Hydra*-র সৃষ্টি হয় । *Hydra* দু'ভাবে অযৌন জনন সম্পন্ন করে, যথা- মুকুলোদগম ও বিভাজন । নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

১. মুকুলোদগম (Budding) : এটি অযৌন জননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বছরের সব ঋতুতেই বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকায় এটি বেশি ঘটে । নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি ধাপে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়

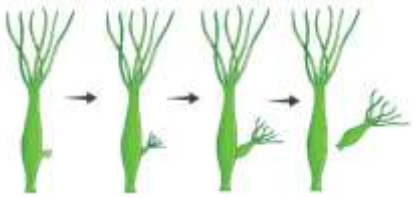
Hydra-র মুকুলোদগম

i. প্রক্রিয়ার শুরুতে দেহের মধ্যাংশ বা নিম্নাংশের কোন স্থানের এপিডার্মিসের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র স্ফীত অংশের সৃষ্টি করে ।
ii. স্ফীত অংশটি ক্রমশ বড় হয়ে ফাঁপা, নলাকার মুকুল (bud)-এ পরিণত হয় । এতে এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস সৃষ্টি হয় ।
iii. মাতৃ হাইড্রার সিলেন্টেরন মুকুলের কেন্দ্রে প্রসারিত হয় ।
iv. মুকুলটি মাতৃ হাইড্রা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বড় হয় এবং শীর্ষপ্রান্তে গঠিত হয় মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা ।
v. এসময় মাতৃ হাইড্রা ও মুকুলের সংযোগস্থলে একটি বৃত্তাকার খাঁজের সৃষ্টি হয় । খাঁজটি ক্রমে গভীর হয়ে মুকুল তথা অপত্য হাইড্রাকে মাতৃ হাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ।
vi. অপত্য হাইড্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয় ।
vii. শিশু হাইড্রা কিছুক্ষণ বিচরণের পর নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সংলগ্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে ।

ঘটনাক্রমে একটি *Hydra*-য় বেশ কয়েকটি মুকুলের সৃষ্টি হতে পারে । এসব মুকুল আবার নতুন মুকুল সৃষ্টি করতে পারে । সম্পূর্ণ মাতৃ *Hydra*-কে তখন একটি দলবদ্ধ প্রাণীর মতো দেখায় । মুকুল সৃষ্টি এবং মাতৃ *Hydra* থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে ।

বিভাজন (Fission) : বিভাজন কোনো স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া নয় কারণ এটি দৈবাৎ সংঘটিত হয় । কোন বাহ্যিক কারণে হাইড্রার দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে নতুন হাইড্রা জন্মায় । একে পুনরুৎপত্তি (regeneration) বলে, কারণ এ প্রক্রিয়ায় দেহের হারানো বা বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হয় । প্রকৃতিবিজ্ঞানী ট্রেম্বলে (Trembley) ১৭৪৪ সালে সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন । এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ অতিদ্রুত বিভক্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি করে । এসব কোষ দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ গঠনের মাধ্যমে অপত্য হাইড্রার বিকাশ ঘটে । সুতরাং হাইড্রার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই । বিভাজন দুভাবে হতে পারে, যথা-অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন ও অনুপ্রস্থ বিভাজন ।

i. অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন : হাইড্রার দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পৃথক হাইড্রার উৎপত্তি হয় ।

ii. অনুপ্রস্থ বিভাজন : কোনো কারণে হাইড্রার দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় নতুন হাইড্রা জন্ম লাভ করে

যৌন জনন (Sexual reproduction):

যে পদ্ধতিতে জীব হ্যাপ্লয়েড (n সংখ্যক) জননকোষ, যথা-শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠন ও তাদের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুজীব উৎপন্ন করে তাকে যৌন প্রজনন বলে । যৌন প্রজনন সাধারণত শীতকালে ঘটে । অধিকাংশ হাইড্রা একলিঙ্গ (monoecious) অর্থাৎ এদের দেহে শুক্রাশয় অথবা ডিম্বাশয় গঠিত হয় । তবে কিছু প্রজাতি উভলিঙ্গ (dioecious) অর্থাৎ এদের দেহে একই সাথে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় উপস্থিত থাকে । **একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই পরনিষেক প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে** । কারণ উভয় প্রকার জনন কোষ একই সময়ে পরিপক্কতা লাভ করে না । এক হাইড্রার ডিম্বাণু অপর হাইড্রার শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে একে পরনিষেক বলে । তাই অনেক প্রজাতি উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাদের জননকোষগুলো একই সময়ে পরিপক্কতা লাভ করে না বলে হাইড্রায় স্বনিষেক ঘটে না । হাইড্রার দেহে স্থায়ী কোন জননাঙ্গ থাকে না । এপিডার্মিসের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত ও রূপান্তরিত হয়ে জননাঙ্গ ও জননকোষ গঠন করে । সম্পূর্ণ প্রজনন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত তিনটি ধাপে ঘটে, যথা-

হাইড্রার জনন অঙ্গ

১. জননকোষ গঠন বা গ্যামেটোজেনেসিস, ২. নিষেক এবং ৩. পরিস্ফুটন । নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো-

১. গ্যামেটোজেনেসিস : যে প্রক্রিয়ায় ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ রূপান্তরিত ও বিভাজিত হয়ে জননকোষ গঠন তাকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে । গ্যামেটোজেনেসিস দুভাগে বিভক্ত, যথা- স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিস নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো

ক. শুক্রাশয়ের উৎপত্তি বা স্পার্মাটোজেনেসিস : প্রজনন ঋতুতে সাধারণত দেহের উপরের অর্ধাংশে হাইপোস্টোমের কাছাকাছি স্থানের এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে এক বা একাধিক মোচাকার শুক্রাশয় (testis) সৃষ্টি হয় । এর শীর্ষে একটি বোঁটা বা নিপল (nipple) এবং পরিণত শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য শুক্রাণু । শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস (spermatogenesis) বা শুক্রাণুজনন বলে । শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ শুক্রাণু মাতৃকোষ (sperm mother cell) হিসেবে কাজ করে । কোষগুলো বারংবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে স্পার্মাটোগোনিয়া (spermatogonia) সৃষ্টি করে । পরে এগুলো বৃদ্ধিলাভ করে স্পার্মাটোসাইট (spermatocyte)-এ পরিণত হয় । প্রত্যেক স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি করে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পার্মাটিড (spermatid) উৎপন্ন করে । প্রত্যেক স্পার্মাটিড একেকটি শুক্রাণু (sperm)-তে পরিণত হয় । প্রত্যেক পরিণত শুক্রাণু নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি **স্ফীত মস্তক (head)**, সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি **সংকীর্ণ মধ্য খন্ডক (middle piece)** এবং একটি লম্বা, সরু, বিচলনক্ষম **লেজ (tail)** নিয়ে গঠিত।

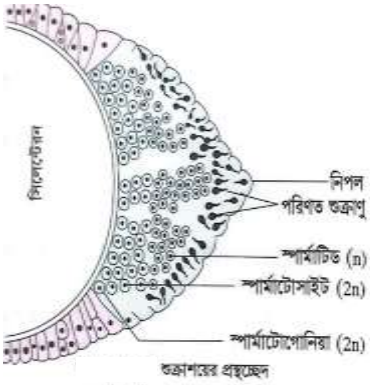

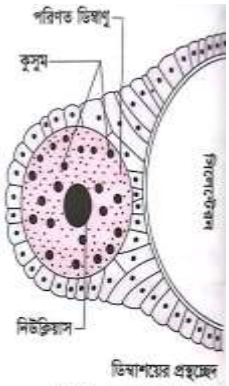

খ. ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি ও উওজেনেসিস : প্রজনন ঋতুতে দেহের নিচের অর্ধাংশে, কিন্তু পদতলের সামান্য উপরে এপিডার্মিসের একটি বা দুটি স্থানের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের বারংবার বিভাজনের ফলে সাধারণত একটি বা দুটি গোলাকার ডিম্বাশয় (ovary) সৃষ্টি করে । প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে একটি করে ডিম্বাণু (ovam) সৃষ্টি হয় । ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস (oogenesis) বা ডিম্বাণুজনন বলে । ডিম্বাশয়ে বিদ্যমান কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ডিম্বাণু মাতৃকোষ (egg mother cell) হিসেবে কাজ করে । কোষগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে উওগোনিয়া (oogonia) গঠন করে । এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রস্থ একটি কোষ বড় হয়ে উওসাইট (oocyte)-এ পরিণত হয় এবং ছোট কোষগুলোকে গলাধঃকরণ করে । এটি তখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটিয়ে ৩টি ক্ষুদ্র পোলার বড়ি (polar body) ও ১টি বড় সক্রিয় উওটিড (ootid) সৃষ্টি করে । উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। পোলার বডিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় । ডিম্বাণুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে ডিম্বাশয়ের বহিরাবরণ ছিঁড়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে উন্মুক্ত করে দেয় । এর চারদিকে তখন জিলেটিনের পিচ্ছিল আস্তরণ থাকে ।

২. নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু পরিণত হলে শুক্রাশয়ের নিপল বিদীর্ণ করে শুক্রাণুগুলো ডিম্বাণুর সন্ধানে পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতরাতে থাকে । **২৪ - ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারলে এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়** । অন্যদিকে, উন্মুক্ত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে নিষিক্ত না হলে ডিম্বাণুও নষ্ট হয়ে ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে । শুক্রাণুর ঝাঁক একেকটি ডিম্বাণুর চারদিক ঘিরে ফেলে । একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও একটি মাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে এবং একটি ডিপ্লয়েড (২n) জাইগোট (zygote) গঠন করে ।

৩. পরিস্ফুটন (Development) : যেসব ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাকে পরিস্ফুটন বলে । জাইগোট নানা ধরনের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয় ।

হাইড্রার পরিস্ফুটনকালে নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ দেখা যায় ।

ক. মরুলা (Morula) : জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারবার বিভক্ত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষপিণ্ডে পরিণত হয় । এর নাম মরুলা ।

খ. ব্লাস্টুলা (Blastula) : শীঘ্রই মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয়ে একটি ফাঁপা, গোল ভ্রুণে পরিণত হয় । এর নাম ব্লাস্টুলা । ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) এবং **কেন্দ্রে ফাঁকা গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল (blastocoel) বলে** ।

গ. গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula): ব্লাস্টুলা গ্যাস্ট্রুলেশন (gastrulation) প্রক্রিয়ায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। এক্টোডার্মের কোষগুলো থেকে নিঃসৃত একপ্রকার পদার্থ গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে একটি কাইটিন নির্মিত কাঁটাযুক্ত সিস্ট (cyst) বা আবরণী গঠন করে। সিস্টবদ্ধ ভ্রুণটি মাতৃ হাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির তলদেশে চলে যায়।

ঘ. হাইড্রুলা (Hydrula): বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টের মধ্যেই ভ্রুণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে এবং এর অগ্রপ্রান্তে হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র ও কর্ষিকা এবং পশ্চাৎপ্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়। ভ্রুণের এ দশাকে হাইড্রুলা বলে। হাইড্রুলা সিস্টের আবরণী বিদীর্ণ করে পানিতে বেরিয়ে আসে এবং স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

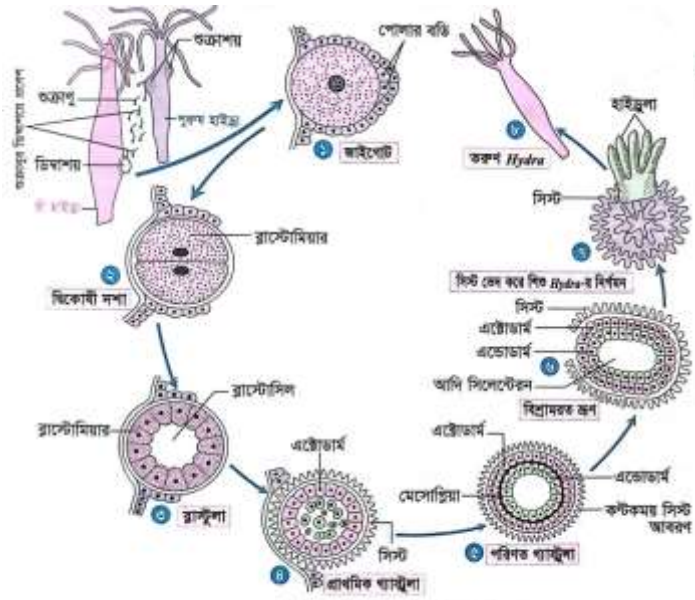

Hydra-র নিষেক ও পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ

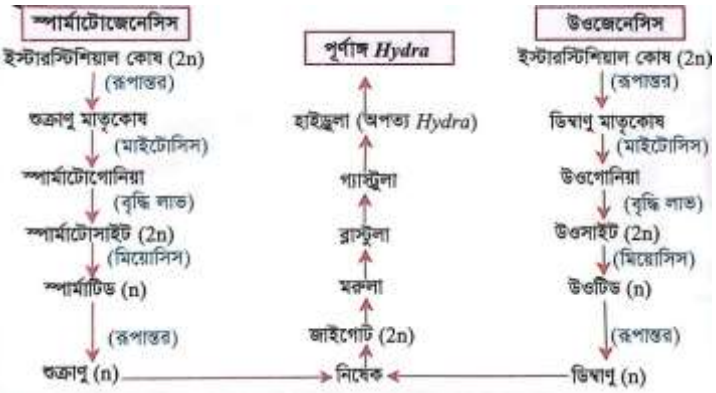

Hydra-র যৌন জনন ও পরিস্ফুটনের প্রবাহচিত্র

Hydra-য় মিথোজীবিতা (Symbiosis in *Hydra*)

মিথোজীবিতা বা সিমবায়োসিস (symbiosis; গ্রিক, symbioum = live together) এর উৎপত্তিগত অর্থ-একত্রে বাস করা। মিথোজীবিতা তিনটি ভিন্ন মাত্রার হতে পার। তবে *Hydra*-র ক্ষেত্রে মিথোজীবিতার সংজ্ঞা হলো-

যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীবদুটিকে মিথোজীবী (symbiont) বলা হয়।

উদাহরণ- *Hydra viridissima* (*Chlorohydra viridissima*) নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlorella* নামক এককোষী সবুজ শৈবালের মধ্যে এ সম্পর্ক সুস্পষ্ট দেখা যায়। *Zoochlorella* বা সবুজ শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে বাস করে। হাইড্রা অর্ধস্বচ্ছ প্রাণী হওয়ায় এ শৈবালের অস্তান্ত উপস্থিতি এ হাইড্রাকে সবুজ বর্ণ দান করে এবং এজন্য হাইড্রাটিও বাইরে থেকে সবুজ দেখায়। নিম্নোক্তভাবে এর পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়। এরা একটি হতে অপরটি কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এমনকি ডিম্বাণুর সাথে শৈবাল প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

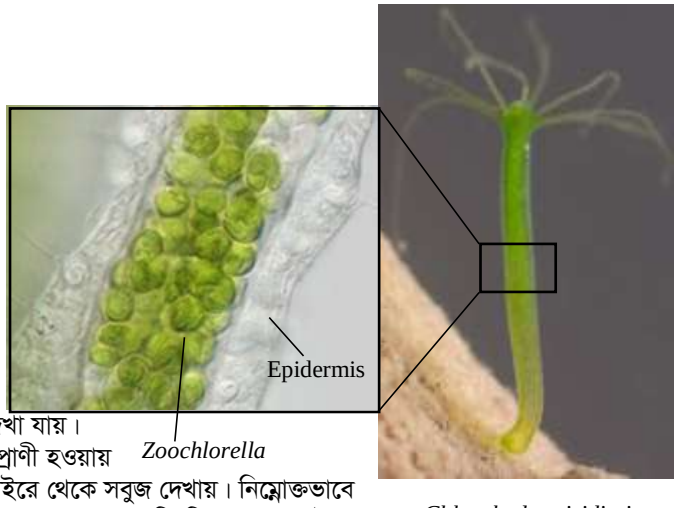

Chlorohydra viridissima

শৈবালের প্রাপ্ত উপকার

i. আশ্রয়: শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল (অন্তঃকোষীয়) পেশি-আবরণী কোষে আশ্রয় পায়।

ii. সালোকসংশ্লেষণ: হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 কে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে।

iii. খাদ্যোৎপাদন: হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত N_2 জাত বর্জ্যপদার্থকে আমিষ তৈরির কাজে ব্যবহার করে

***Hydra*-র প্রাপ্ত উপকার**

i. খাদ্যপ্রাপ্তি: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ করে।

ii. শ্বসন: সালোকসংশ্লেষণকালে শৈবাল যে O_2 নির্গত করে হাইড্রা তা শ্বসনে ব্যবহার করে।

iii. CO_2 শোষণ: হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে ঝামেলামুক্ত করে।

iv. বর্জ্য নিষ্কাশন: হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট N_2 ঘটিত বর্জ্য শৈবাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় হাইড্রা সহজেই বর্জ্যপদার্থ মুক্ত হয়।